ভারত

স্বাধীন হলো

INDIA WINS FREEDOM

अबुल कलाम आज़ाद

ABUL KALAM AZAD

ভারত স্বাধীন হলো

INDIA WINS FREEDOM

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

KOBI PROKASHANI

ভারত স্বাধীন হলো
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৫৮০ টাকা

India Wins Freedom by Maulana Abul Kalam Azad Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: August 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 580 Taka RS: 580 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99332-7-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

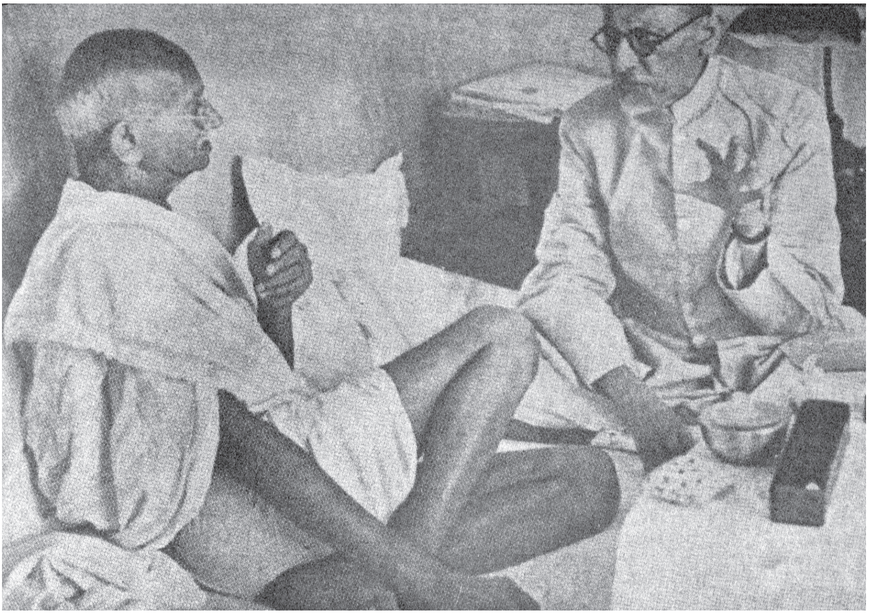

১৯৪৬ : গান্ধীজি ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

৫ মে, ১৯৪৬ : কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের ভাইসরয়-প্রাসাদে এসে পৌঁছানোর মুহূর্ত। বাঁদিক থেকে : মি. এ. ভি. আলেকজান্ডার, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, মৌলানা আজাদ, লর্ড পেথিক লরেন্স।

৫ মে, ১৯৪৬ : সিমলায় অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে মৌলানা আজাদ ও লর্ড পেথিক লরেন্স।

সম্মেলনের উদ্বোধনে ভারতের ভাইসরয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে করমর্দন করছেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ : ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা।

মীরাট কংগ্রেস, ১৯৪৬ : কৃপালনী, প্যাটেল, আজাদ, গফর খাঁ।

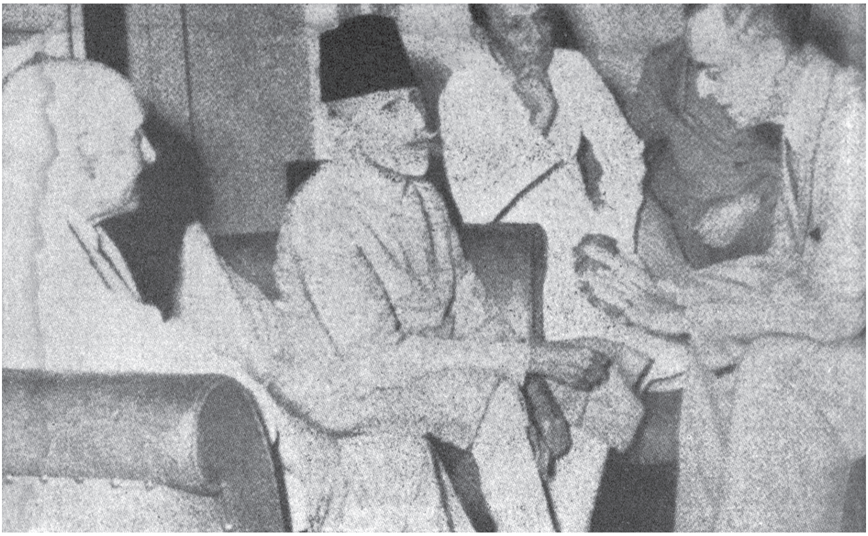

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও মি. আসফ আলীর সঙ্গে কেবিনেট মিশনের সাক্ষাৎকার। বাঁদিক থেকে : লর্ড পেথিক লরেন্স, মৌলানা আজাদ, মি. আসফ আলী, মি. এ. ভি. আলেকজান্ডার, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।

জুলাই, ১৯৪৬ : বম্বেতে অনুষ্ঠিত এআইসিসির সভা।

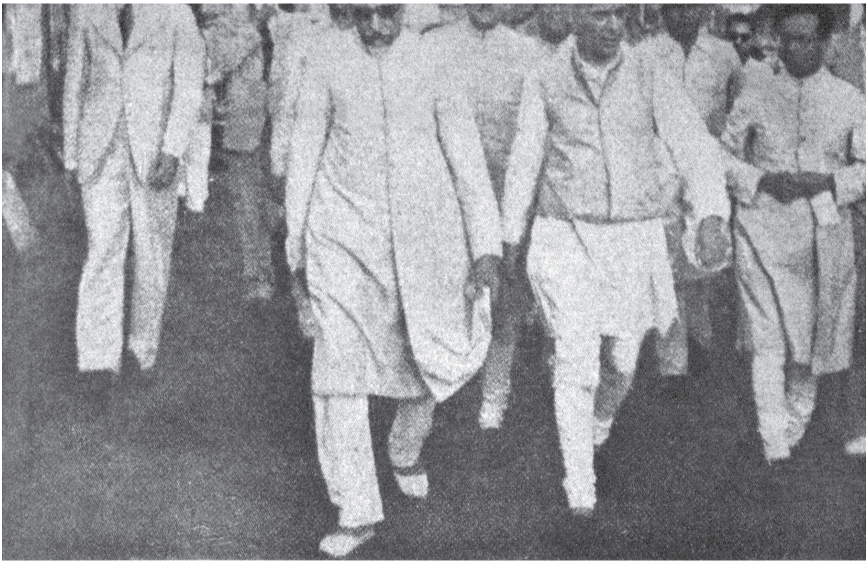

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দিল্লির সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মুহূর্তে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ পরিভ্রমণান্তে পালাম বিমানবন্দরে মৌলানা আজাদ।

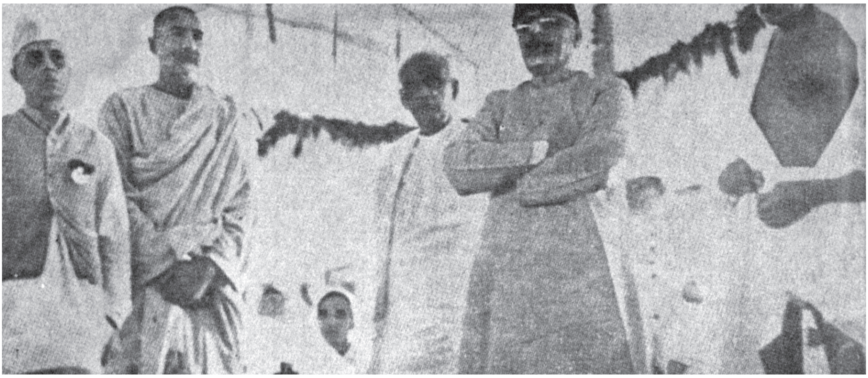

১৯৪৭ : দিল্লির এআইসিসি সভায় পণ্ডিত নেহরু, বাদশাহ খাঁ, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও গান্ধীজি।

মহাত্মা গান্ধীকে দাহ করার মুহূর্তে রাজকুমারী অমৃত কাউর, লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেন, প্যামেলা মাউন্টব্যাটেন, মৌলানা আজাদ এবং ভারতে চীনা প্রতিনিধি ড. লো চিয়া লুয়েম।

সূচিপত্র

পূর্বাভাষ	১৩
প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্তসার	১৭
ক্ষমতার আসনে কংগ্রেস	৩১
ইউরোপে যুদ্ধানল	৪৩
আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হলাম	৫১
অন্তর্বর্তী নাট্যে চৈনিক ভূমিকা	৬৩
ক্রিপস দৌত্য	৬৮
অন্তর্বর্তীকালীন উত্তেজনা	৯৬
ভারত ছাড়ো প্রস্তাব	১০০
আহম্মদনগর ফোর্ট জেল	১১৫
সিমলা সম্মেলন	১৩০
সাধারণ নির্বাচন	১৪৯
মন্ত্রিমিশন	১৭০
ভারতবিভাগের প্রাক-পর্ব	১৮৬
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার	১৯৯
মাউন্টব্যাটেন মিশন	২১৯
একটি স্বপ্নের শেষ হলো	২৩১
বিভক্ত ভারত	২৪৬
উপসংহার	২৬৫
পরিশিষ্ট	২৭১

পূর্বাভাষ

বছর দুয়েকের কিছু আগে আমি যখন মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আত্মজীবনী রচনা করতে অনুরোধ করি তখন মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারিনি, আমাকেই এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার শোকাবহ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না; তাই প্রথমে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁকে বলি, ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেই ঘটনাবলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং যেহেতু উক্ত ব্যাপারে তিনি একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেইহেতু একমাত্র তিনিই উক্ত ঘটনাবলিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন এবং এর জন্য তাঁর একটা দায়িত্বও আছে। তখন তিনি সময়াভাব এবং শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে এ ব্যাপারে তেমন কোনো উৎসাহ দেখান না। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, তাঁর ওপরে ন্যস্ত সরকারি দায়িত্ব এবং জনগণের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করার পর এ কাজের জন্য সময় ব্যয় এবং মস্তিষ্কচালনা তাঁর শরীরে কুলোবে না। কিন্তু আমি যখন তাঁকে কথা দিই, লেখার দায়িত্ব যাতে তাঁর ওপরে না চাপে সেজন্য ও ব্যাপারে আমি তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করব তখন তিনি আর আপত্তি তোলেননি। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, লেখার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করার ফলে বিষয়টার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ভারতের জনসাধারণ তাঁর নিজের লেখা আত্মজীবনী পড়বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। তবে আদৌ কিছু না পাবার পরিবর্তে তাঁর বক্তব্যের ইংরেজি প্রতিরূপ নিশ্চয়ই জনসাধারণের কাম্য হবে।

এবারে গ্রন্থটি কীভাবে রচিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার বোধ করছি। গত দুবছর বা তার কাছাকাছি আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় কমপক্ষে এক ঘণ্টা মৌলানা আজাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। এটি আমার নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই নিয়মিত হাজিরার ব্যতিক্রম শুধু সেই কদিনই হয়েছে, যে কদিন আমি দিল্লিতে উপস্থিত থাকতে পারিনি।

মৌলানা সাহেবের কথা বলার ধারাটা এতই চমৎকার ছিল যে নিতান্ত দুরূহ বিষয়ও তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। আমি তাঁর সামনে বসে নোট নিয়েছি এবং মাঝে মাঝে কোনো কোনো বিষয় সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়েছি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে

চাইতেন না। তবে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি খোলাখুলিভাবেই বলতেন। এইভাবে একটা পরিচ্ছেদ লেখার মতো উপকরণ যখন আমার হাতে এসেছে তখন আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে একটা খসড়া তৈরি করে তাঁর হাতে দিয়েছি। প্রতিটি পরিচ্ছেদের খসড়া প্রথমে তিনি নিজে পড়তেন, তারপর আমরা দুজনে মিলে আবার পড়তাম, আলোচনা করতাম। এই সময় (অর্থাৎ পরবর্তী আলোচনার সময়) তিনি অনেক কিছু পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করেছেন। আবার প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো বিষয় একেবারেই বাদ দিয়েছেন। শেষ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি পর্যন্ত এইভাবেই আমরা কাজ করেছি, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রন্থটির পুরো খসড়া-পাণ্ডুলিপি মৌলানা সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছি।

পাণ্ডুলিপির খসড়াটি হস্তগত হবার পর মৌলানা সাহেব সিদ্ধান্ত নেন, তা থেকে ত্রিশখানা পৃষ্ঠা (যাতে ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছিল) বর্তমানে প্রকাশ করা হবে না। তিনি নির্দেশ দেন, পরিত্যক্ত প্রতিটি বিষয়ের একটি করে কপি সিলমোহর করা খামে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং নয়াদিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত থাকবে। তিনি আরও বলেন, উক্ত প্রত্যাহৃত অংশগুলিকে কোনোক্রমেই কোনোভাবে পরিবর্তন করা চলবে না। (অর্থাৎ ঠিক যেভাবে তিনি বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করেছেন এবং প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার কোনোরকম পরিবর্তন করা চলবে না।)

এরপর মৌলানা আজাদের নির্দেশ অনুসারে আমি কিছু কিছু পরিবর্তন এবং সংক্ষেপন করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষদিকে পাণ্ডুলিপির সংশোধিত খসড়াটি তাঁর হাতে তুলে দিতে সক্ষম হই।

এর পরেই আমি কিছুদিনের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাই। আমার অনুপস্থিতকালে মৌলানা সাহেব আর একবার পাণ্ডুলিপিটা পড়েন। এরপর আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসে দুজনে মিলে আবার পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসি। এই সময় আমরা প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রতিটি লাইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করি। এবারেও মৌলানা সাহেবের নির্দেশে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়, তবে বড়রকমের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। কোনো কোনো পরিচ্ছেদ তিনবার বা চারবারও সংশোধন করা হয়।

সংশোধনের কাজ শেষ হবার পর প্রজাতন্ত্র দিবসে মৌলানা সাহেব আমাকে বলেন, পাণ্ডুলিপিটা পড়ে তিনি খুশি হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এবার এটিকে ছাপতে দেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থটি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হলো তাঁর অনুমোদিত খসড়া-পাণ্ডুলিপিরই মুদ্রিত রূপ। মৌলানা আজাদের ইচ্ছে ছিল গ্রন্থটি তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিনে (অর্থাৎ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে) প্রকাশ করতে হবে; কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হলো তখন তিনি আর ইহজগতে নেই।

আগেই বলেছি, এ বই লেখার ব্যাপারে মৌলানা সাহেব প্রথম দিকে মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না; কিন্তু পরবর্তীকালে রচনার কাজ যতই এগোতে থাকে ততই তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিগত ছমাসে তিনি প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যাই পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ব্যক্তিগত ঘটনাবলি প্রকাশ করার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনপঞ্জির প্রথম অংশ লিখতে সম্মত হন। উক্ত প্রথম অংশের একটি সংক্ষিপ্তসারও তিনি তৈরি করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে উক্ত সংক্ষিপ্তসার এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত আরও একটি কথা বলে রাখা দরকার, আত্মজীবনীর একটি তৃতীয় খণ্ডও তাঁর লেখার ইচ্ছে ছিল (যাতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তীকালের ঘটনাবলি থাকবে), কিন্তু সে খণ্ডটি আর কোনোদিনই লেখা হবে না।

আমার কাছে এই গ্রন্থটি লেখার কাজ ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আমার এই আনন্দ, আরও বর্ধিত হবে যদি আমি বুঝতে পারি মৌলানা সাহেবের প্রকৃত মানসকে আমি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছি। তাঁর এই মানস হলো ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুষ্ঠু সমঝোতা সৃষ্টি করে এক বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্র সৃষ্টির প্রয়াস। তিনি আশা করতেন ভারত এবং পাকিস্তানের অধিবাসীরা পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবে এবং একে অপরের প্রতি প্রতিবেশীর মতো আচরণ করবে। এই মনোভাবের জন্যই তিনি 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্' নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন, উক্ত প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। এই মনোভাব নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দেন (এইটিই তাঁর সর্বশেষ মুদ্রিত ভাষণ) তাতে তিনি উভয় রাষ্ট্রের জনগণকে (যাঁরা মাত্র দশ বছর আগেও একই অবিভক্ত দেশের অধিবাসী ছিলেন) নিজেদের ভেতরের সমস্ত বাদবিসংবাদ এবং বিভেদের কথা ভুলে গিয়ে সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হতে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিলেন।

আমি তাই মনে করি, ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাত্রমূলক সমঝোতা সৃষ্টির জন্য এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি বড় অংশ উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দিলেই সবচেয়ে ভালো কাজ হবে। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই পাকা হয়। স্থির হয়, এই গ্রন্থের রয়েলটির একটা অংশ পাবেন মৌলানা আজাদের নিকটতম আত্মীয়েরা এবং বাকি অংশ পাবে কাউন্সিল। আরও স্থির হয়, কাউন্সিলের হাতে যে অর্থ আসবে তা ব্যয় করা হবে দুটি বাৎসরিক পুরস্কারের মাধ্যমে। একটি পুরস্কার দেওয়া হবে ইসলামের ওপরে অমুসলমানদের লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের রচয়িতাকে এবং অপর পুরস্কারটি দেওয়া হবে হিন্দুধর্মের ওপরে মুসলমানদের লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের প্রণেতাকে। মৌলানা আজাদ তরুণদের খুব বেশি ভালোবাসতেন বলে আরও স্থির হয়, প্রতি বছর বাইশে ফেব্রুয়ারি যাদের বয়স ত্রিশ বছর বা তার নিচে থাকবে, তারাই শুধু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একটি বিষয় আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই। বিষয়টি হলো, এই গ্রন্থে এমন কিছু কিছু মন্তব্য ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোর সঙ্গে আমি একমত নই। অতএব কেউ যেন মনে না করেন, এতে যেসব মতামত ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো আমারও মতামত। মৌলানা আজাদ যখন জীবিত ছিলেন তখন আমি তাঁর কাছে অনেক বিষয়ে আমার মতানৈক্যের কথা বলছি। আমার কথাগুলো তিনি ধীরভাবে শুনেছেন এবং তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে গ্রন্থের কোনো কোনো জায়গায় পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করেছেন। তাঁর একটি মহৎ গুণ ছিল পরমতসহিষ্ণুতা। তাছাড়া তাঁর মনটিও ছিল অত্যন্ত উদার এবং বিচারবুদ্ধিযুক্ত। এই কারণেই তিনি অপরের মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করতেন এবং ভালো মনে হলে তা গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। আবার যেসব ক্ষেত্রে আমার অভিমতকে তিনি মেনে নিতে পারতেন না সেসব ক্ষেত্রেও তিনি কোনোরকম বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে হাসিমুখে বলতেন, 'আমার নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।' আজ যখন তিনি আর ইহজগতে নেই তখন তাঁর মন্তব্য এবং অভিমতসমূহ যেভাবে তিনি রেখে গেছেন ঠিক সেইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, এতে আমার মতামতের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

পরিশেষে যে কথাটা আমি বলতে চাই, তা হলো, কোনো ব্যক্তির পক্ষে অপর কোনো ব্যক্তির মনোভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। এমনকি, উভয় ব্যক্তি যখন একই ভাষাভাষী হয় তখনও দেখা যায়, সামান্য একটিমাত্র শব্দের পরিবর্তন ঘটালেও সম্পূর্ণ বিষয়টি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। প্রথমত বলা চলে, মৌলানা সাহেব তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতেন উর্দু ভাষায় এবং আমি তাঁর সেই উর্দু কথাগুলোকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতাম। উর্দু ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতোই সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য; অপরপক্ষে ইংরেজি ভাষা মূলত বক্তব্য-সংক্ষেপক ভাষা হওয়ায় (essentially a language of understatement) বক্তার মনোভাব পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। বিশেষ করে বক্তা যেখানে মৌলানা আজাদের মতো একজন উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং লেখক তাঁর বক্তব্যের ইংরেজি অনুবাদক, সেখানে যে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এইসব অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও আমি আমার সাধ্যানুসারে তাঁর বক্তব্যবিষয়কে বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি। এখানে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার এই, আমার রচনা মৌলানা সাহেবের অনুমোদন লাভ করেছে।

নয়াদিল্লি **হুমায়ুন কবীর**
১৫ মার্চ, ১৯৫৮

প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্তসার

আমার পূর্বপুরুষরা হেরাত থেকে ভারতে এসেছিলেন বাবরের আমলে। ভারতে এসে প্রথমে তাঁরা আগ্রায় বসবাস করতে থাকেন, পরে সেখান থেকে দিল্লিতে চলে আসেন। পরিবারটি শিক্ষার দিক থেকে বিশেষ উন্নত ছিল। আকবরের আমলে এই পরিবারের মৌলানা জামালউদ্দিন ধার্মিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। জামালউদ্দিন সাহেবের পরে এই পরিবার বৈষয়িক উন্নতির দিকে নজর দেন; যার ফলে এই পরিবারের কয়েকজন লোক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হন। এই ধারা পরবর্তীকালেও চলতে থাকে। শাহজাহানের আমলে এই পরিবারের অন্যতম কৃতী পুরুষ মহম্মদ হাদি আগ্রা দুর্গের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন।

আমার প্রমাতামহ (অর্থাৎ আমার পিতার মাতামহ) মৌলানা মুনাওয়ারউদ্দিন ছিলেন মোগল আমলের সর্বশেষ রুকন্-উল্ মুদারাসিন। এই পদটি প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিল শাহজাহানের আমলে। সাম্রাজ্যের শিক্ষা এবং শিক্ষা-উন্নয়ন ব্যবস্থাগুলোর তদারকি করবার জন্যই পদটি সৃষ্ট হয়। এই পদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকতেন তাঁর নির্দেশেই অনুদানসমূহ প্রদত্ত হতো। অনুদান নানারকমের ছিল, যেমন নগদ অর্থসাহায্য, ভূ-সম্পত্তি প্রদান এবং বার্ধক্যবৃত্তি। খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং শিক্ষাব্রতীদের এইসব অনুদান দেওয়া হতো। সে আমলের এই পদাধিকারীকে হাল আমলের শিক্ষা অধিকর্তার পদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, পরবর্তীকালে মোগল রাজশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তাঁদের সৃষ্ট অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ এখনও প্রচলিত রয়েছে।

আমার পিতা মৌলানা খয়েরউদ্দিনের বয়স যখন খুবই অল্প সেই সময় আমার পিতামহের মৃত্যু হয়। পিতৃহীন হবার পর তাঁর প্রতিপালনের ভার নেন তাঁর মাতামহ। সিপাহি বিদ্রোহের দুবছর আগে মৌলানা মুনাওয়ারউদ্দিন ভারতে তৎকালীন অবস্থা দেখে বিরক্ত হয়ে মক্কায় চলে যাবেন বলে স্থির করেন। মক্কার পথে তিনি যখন ভূপালে উপনীত হন তখন ভূপালের নবাব সিকান্দার জাহান বেগম তাঁকে কিছুদিন ওখানে থেকে যেতে বলেন। তিনি ভূপালে থাকাকালেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়, যার ফলে দুবছর তিনি স্থানত্যাগ করতে পারেন না। এরপর তিনি বোম্বাইতে যান, কিন্তু মক্কায় যাওয়া তাঁর হয় না, কারণ বোম্বাইতে এসেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমার পিতার বয়স তখন পঁচিশ বছর। তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ওখানে তিনি নিজস্ব বাসভবন তৈরি করে শেখ মহম্মদ জাহের ওয়াত্রির কন্যাকে বিবাহ করেন। শেখ মহম্মদ জাহের ছিলেন মদিনার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন আরবের সীমা ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমার পিতা কর্তৃক আরবিতে রচিত দশ খণ্ডে বিভক্ত এক বিরাট গ্রন্থ মিসর থেকে প্রকাশিত হবার পর তিনিও ইসলাম-জগতে সুপরিতি হয়ে পড়েন। তিনি কয়েকবার বোম্বাইতে এবং একবার কলকাতায় এসেছিলেন। উভয় স্থানেই বহু লোক তাঁর গুণগ্রাহী এবং শিষ্য হন। ইরাক, সিরিয়া এবং তুরস্কেও তিনি ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন।

মক্কা শহরে তখন পানীয় জলের প্রধান উৎস ছিল নহ্র জুবেইদা নামে একটি খাল। এটি খনন করিয়েছিলেন খলিফা হারুন-অল-রশিদের পত্নী বেগম জুবেইদা। কালক্রমে উক্ত খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় মক্কা শহরে জলাভাব দেখা দেয়। এই জলাভাব আরও প্রকট হয়ে উঠত হজের সময়। তীর্থযাত্রীরা জলের অভাবে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করতেন। আমার পিতা এই খালটি সংস্কার করেন। ভারত, মিসর, সিরিয়া এবং তুরস্ক থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে খালটিকে তিনি এমনভাবে উন্নত করেন যার ফলে বেদুইনরা ওটার কোনোরকম ক্ষতি করবার সুযোগ পায় না। এই সময় তুরস্কের সম্রাট ছিলেন সুলতান আবদুল মজিদ। আমার পিতার এই সৎ কাজের কথা জানতে পেরে তিনি তাঁকে তুরস্কের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান-প্রতীক মজিদী পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

এবার আমার কথা বলছি। আমার জন্ম হয় মক্কা শহরে, ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। আমার জন্মের দুবছর পরে অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে আমার বাবা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। কিছুদিন আগে জেদ্দায় আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। হাড়টাকে সংস্থাপিত করা হলেও সেটা ঠিকমতো সেট না হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় থেকে যাবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। তাঁকে বলা হয়, কলকাতার সার্জনরা তাঁর হাড়কে ঠিকমতো সেট করে দিতে পারবেন। তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন, কলকাতায় তিনি বেশিদিন থাকবেন না। কিন্তু তাঁর শিষ্য আর ভক্তরা তাঁকে ছেড়ে দিতে চান না। আমরা কলকাতায় আসবার এক বছর পরে আমার মায়ের মৃত্যু হয় এবং ওখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

আমার পিতা ছিলেন প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি সুনজরে দেখতেন না এবং এই কারণে আমাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। তাঁর মতে আধুনিক শিক্ষা ছিল ধর্মবিশ্বাসের ধ্বংসকারী শিক্ষা। তিনি তাই প্রাচীন ধারাতেই আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন।

এই প্রাচীন শিক্ষাধারা অনুসারে ভারতের মুসলমান ছেলেদের প্রথমে ফার্সি ও পরে আরবি শেখানো হতো। এই দুটি ভাষা আয়ত্ত করবার পরে তাদের আরবির

মাধ্যমে দর্শনশাস্ত্র, জ্যামিতি, পাটিগণিত এবং বীজগণিত শেখানো হতো। এছাড়া ঐসলামিক কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিও ছিল শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমদিকে বাবা আমাকে বাড়িতেই পড়াতেন, কারণ আমাকে তিনি কোনো মাদ্রাসায় পাঠানো পছন্দ করতেন না। তখন 'কলিকাতা মাদ্রাসা' সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও সেই শিক্ষালয় সম্বন্ধে বাবা মোটেই উচ্চধারণা পোষণ করতেন না। প্রথমদিকে তিনি নিজেই আমাকে পড়াতেন। পরে বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্য তিনি বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলতে।

এই চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব ছেলে লেখাপড়া করত তাদের পড়াশুনা সাধারণত কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে সমাপ্ত হতো। তবে শিক্ষা সমাপ্ত করার আগে কিছুদিন তাদের শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে নবাগত শিক্ষার্থীদের পড়াতে হতো। তারা তাদের অধীত বিষয় কতটা আয়ত্ত করেছে তা দেখার জন্যই এই ব্যবস্থাটি প্রচলিত ছিল। আমি ষোলো বছর বয়সেই আমার শিক্ষা সমাপ্ত করতে সক্ষম হই। বাবা তখন জন-পনেরো নতুন ছাত্র এনে আমার কাছে তাদের পড়তে দেন। এইসব ছাত্রকে আমি উচ্চতর দর্শন, গণিত এবং ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলাম।

এই সময় আমি স্যার সৈয়দ আহম্মদের লেখা শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি রচনা পড়ার সুযোগ পাই। ওইসব রচনায় তিনি আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর মতামত আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আমি বুঝতে পারি, বর্তমান যুগে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলে প্রকৃত শিক্ষালাভ করা যায় না। কিন্তু এসব বিষয় শিখতে হলে ইংরেজি ভাষা জানা দরকার। আমি তাই ইংরেজি শিখব বলে মনে মনে স্থির করি এবং আমার মনোবাসনার কথা প্রাচ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান পরীক্ষক (Chief Examinor of Oriental Course of Studies) মহম্মদ ইউসুফ জাফরীকে বলি। তিনি আমাকে ইংরেজি বর্ণমালা শেখান এবং প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক' পড়তে দেন। ওই বইটি পড়ে ইংরেজি ভাষায় কিছুটা জ্ঞানলাভের পর আমি বাইবেল পড়তে শুরু করি। বাইবেল পড়ার সময় আমি ইংরেজি বাইবেলের সঙ্গে বাইবেলের ফার্সি এবং উর্দু অনুবাদও একই সঙ্গে পড়তে থাকি। এইভাবে পড়ার ফলে ইংরেজি বাইবেলের বিষয়বস্তু সহজেই আমি বুঝতে পারি। এরপর আমি অভিধানের সাহায্য নিয়ে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়া শুরু করি। এইভাবে পড়ার ফলে ইংরেজি ভাষার ওপর আমার যথেষ্ট দখল জন্মে। আমি তখন ইতিহাস এবং দর্শনশাস্ত্র পড়তে শুরু করি।

মানসিক প্রতিক্রিয়া

এই সময় আমার মনোজগতে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি সে পরিবার সবদিক দিয়ে প্রাচীনপন্থী এবং ধর্মীয় অনুশাসনের

বশবর্তী। ওখানে প্রাচীন সংস্কারেরই প্রাধান্য; যা কিছু প্রাচীন তাই ওখানে শ্রেয় বলে বিবেচিত হতো। এবং তা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিও এ পরিবার সহ্য করত না। আমি কিন্তু এই রক্ষণশীলতাকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারিনি। প্রায়ই আমার মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। নিজ পরিবার এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে যে ভাবধারা এবং শিক্ষা আমি লাভ করেছি তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমার মনের কোণে তখন বারবার যে কথাটা উঁকি দিত তা হলো—'সত্য কী এবং সত্যের পথই বা কোনটা?' আমার তখন সব সময়ই মনে হতো, সত্যের সন্ধান আমাকে জানতে হবে এবং নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে সে পথের সন্ধান।

এইরকম মানসিক অবস্থায় পিতৃগৃহের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমি তাই পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে নিজের পথে চলতে থাকি।

এই সময় প্রথমেই যে জিনিসটি আমার মনের ওপর ধাক্কা দেয় তা হলো, বিভিন্ন শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ। একই ধর্মবিশ্বাসের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর কেন খাড়া হয়েছে আমি তা বুঝতে পারিনে। কেন যে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে। রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের এই গোঁড়ামি আর সংকীর্ণ মনোভাব দেখে ধর্ম সম্বন্ধেও আমার মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়। ধর্ম যদি একমাত্র সত্য হয় তাহলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই বা এত বিভেদ কেন? কেনই বা প্রত্যেক ধর্ম নিজেকে একমাত্র সত্য এবং অপর ধর্মকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে!

দু-তিন বছর পর্যন্ত আমার মনে এই ধরনের অস্থিরতা চলতে থাকে। এই সময়টায় আমি এইসব প্রশ্নের সদুত্তর জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ি। আমি তখন শুরু করি পড়াশুনা আর অনুশীলন। স্তরে স্তরে চলতে থাকে এই অনুশীলন পর্ব। অবশেষে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করবার পর আমার মন থেকে সমস্তরকম সংকীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে যায়। পারিবারিক সূত্রে এবং বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তার ফলে আমার মনে নানারকম সংস্কার এসে দানা বেঁধেছিল। আমার মনের ভেতরের সেইসব সংস্কার হঠাৎ যেন কোথায় পালিয়ে গেল। এর পর থেকেই আমি 'আজাদ' (স্বাধীন) ছদ্মনাম গ্রহণ করি। এই ছদ্মনাম গ্রহণের অর্থ হলো, সমস্তরকম সংস্কার এবং সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে আমি মুক্ত করে নিয়েছি। এই বিষয়টা আমার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

বিপ্লবী দলে যোগদান

আমার রাজনৈতিক ধ্যানধারণাও এই সময় পাল্টাতে শুরু করে। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার জন্যই এটা হয়েছিল। ভারতবর্ষের ভাইসরয় তখন লর্ড